OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 332 - 348
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শতবর্ষের আলোয় কালজয়ী ‘রক্তকরবী’ নাট্য : বহুরূপীর মঞ্চায়নে এক অনবদ্য শিল্পকৃতি

ড. চাঁদ কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বালুরঘাট বি.এড. কলেজ (স্বশাসিত)
মঙ্গলপুর, বালুরঘাট, দক্ষিণ
Email ID: chandkumarw.b@gmail.com
0009-0006-0354-9658

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Capitalist, Imperialism, Social system, Internal conflict, Communism, Mass revolution, Human Soul, Farmer, Attraction, overlordship, Thirst for Nectar, Global problems.

Abstract
Rabindranath reflected the aesthetic expression of the inner experiences he had gradually gathered regarding the world and life within his literature. He holds a distinguished place among the world's greatest symbolist playwrights. Rabindranath Tagore's play 'Raktakarabi' (Red Oleanders) was first staged at the E.B. Railway Mansion Institute in Sealdah on May 10, 1954. 'Raktakarabi' marked the eleventh theatrical production by the group 'Bohurupee', following the staging of ten plays-both large and small-in the six years since its inception. The organization deserves the highest praise for this unique production. He wrote 'Raktakarabi' after traveling to Japan, America, and Europe following the First World War. He had witnessed-through the conduct of the British in his own country-how people in a capitalist state sacrifice their humane qualities and engage in shameless competition to plunder one another. The King in 'Raktakarabi' represents a ruler distorted by the capitalist social order; yet, he possesses an intimate, inner self as well. This aspect reveals the transformation of the human soul into a beast. The King mistakenly took a mere fragment of humanity for the whole, and the consequence of this error was the destruction of his own soul; thus, amidst beauty, he yearns for the death of his own bestial nature. The King is not merely a man; he embodies the inhuman force created by the convergence of bureaucratic rule and industrialist exploitation. Yet, ultimately, this impersonal inhumanity itself turns human and rises against its own nature. By killing Ranjan, the King loses his own power but acquires Ranjan's vital life force. Nandini is a woman of the modern age as well as the embodiment of the eternal feminine; while a living human being, she also symbolizes the eternal suffering of humanity. She appears as the one who brings the mantra of liberation to those distorted souls. The character of Bishu embodies a specific philosophical truth envisioned by Tagore, while simultaneously being deeply intertwined with the play's narrative and events. He possesses the unique gift of articulating the anguish of a suppressed heart through the medium of song.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Like Ranjan, Bishu is a formidable warrior in the struggle against the realm of machines. The Professor represents the materialist learning and scientific intellect that form the bedrock of capitalist civilization. The character of the Sardar in 'Raktakarabi' presents a dual nature. Externally, he symbolizes the administrative machinery of the capitalist state. He is ruthlessly committed to maintaining this system of exploitation and control, employing any tactic necessary-whether conciliation, bribery, sowing discord, or coercion. Indeed, while everyone else in Yakshapuri undergoes a transformation under Nandini's influence, the Sardar remains unchanged; ultimately, both the King and the workers—inspired by Nandini-revolt against him. The Gosai serves as a tool for upholding the vested interests of the capitalist and imperialist order; his role is to legitimize unrighteousness as righteousness by cloaking it in scriptural rhetoric. Fagulal is a key leader of the workers' uprising; by the play's conclusion, he too has heroically spearheaded the rebellion-a transformation brought about by Nandini's influence. 'Raktakarabi' is essentially a chronicle of the conflict between a civilization rooted in productive labor and one driven by the lust for possession. Social transformation is an eternal truth, and the play manifests this timeless reality through various symbolic forms. Nandini symbolizes the playful spirit of life, while Ranjan represents youth-a youth whose destruction has cursed the King's existence. Shambhu Mitra demonstrates his courage by attempting to liberate these characters from the heavy burden of allegory while still preserving their symbolic essence; he stands as one of the greatest actors of the modern era. No contemporary actor can compare with him in terms of regal elegance of delivery, clarity of enunciation, refined gravity of voice, and an irresistible magnetism. The issues addressed in this play are not confined to any specific country; they are universal concerns. The production of 'Raktakarabi' by Bohurupee stands as a milestone in the world of Bengali theatre.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমৃত্যু নাট্যরচনার বিচিত্র সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন। তাঁর প্রতিভার ব্যাপ্তি পাঠককে বিস্মিত করে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর যে মানস অভিজ্ঞতা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে, তারই সৌন্দর্যময় প্রকাশ তাঁর সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রবল নাট্যউৎসাহে রবীন্দ্রনাথ একের পর এক রচনা করেছেন গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, পঞ্চাঙ্ক নাটক, প্রহসন ও কৌতুক নাট্য। রবীন্দ্রনাথ যেন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী নাট্যপ্রতিভার অধিকারী। তিনি আগে অভিনেতা পরে নাট্যকার হয়েছেন। নিতান্ত কৈশোরেই তাঁর নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তাঁর নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে অভিনয়ের মাধ্যমে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থখানি পাঠ করলে জানা যায় নাট্যোৎসাহ তাঁর শিশু বয়সেই প্রবল ছিল। ঐ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহপাঠী বন্ধু হরিশচন্দ্র হালদারের কথা উল্লেখ করেছেন। হরিশচন্দ্র ছিলেন নাট্যকার ও মঞ্চসজ্জাকর। তাঁর নাটকের নাম 'মুক্তকুন্তলা'। এ নাটকটিতে নারীচরিত্রে রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটক, পরিচালনা এবং বহুক্ষেত্রে প্রধান অভিনেতা তিনিই। এ প্রসাঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, -

"শিশিরবাবু একাধিকবার বলেন যে; রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।"[১]

রবীন্দ্রনাথ এমন এক ধরনের নাটক রচনার ভাবনায় পীড়িত হচ্ছিলেন, যার দ্বারা তাঁর মৌলিক নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। সেজন্যে প্রচলিত নাট্যধারাকে পরিত্যাগ করে তিনি নতুন রীতির নাট্যরচনার ভাবনায় মগ্ন হন। সেই ভাবনার ফলশ্রুতি তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাঙ্কেতিক নাট্যকারগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারি। যদিও বাংলা সাহিত্যে নাট্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্যকোনো নাট্যকার নাটক রচনায় এই রীতি গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রনাথই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাংলা নাট্যসাহিত্যে সংকেতবাদী নাট্য রচনার স্রষ্টা। তা ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রবীন্দ্রনাথের এই সব সাঙ্কেতিক নাটকের অভিনয় হয়েছে এবং আজও হয়। এ খবর আমাদের জানা আছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন প্যারিস নগরীর উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলেছে, তখনও প্যারিসের বেতারে 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয়পর্বের নাটকগুলি রূপক সাংকেতিক পর্ব নামে অভিহিত। এই পর্বের শুরু 'শারদোৎসব' নাটক দিয়ে। তারপর 'অচলায়তন', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'রথের রশি' ও 'তাসের দেশ'।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নাট্যকারগণ এই সাঙ্কেতিক নাটক রচনা করেছেন। এই রীতির নাটকের জন্মভূমি ফরাসী দেশের নাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্কের 'দ্য ব্লু বার্ড', 'দ্য সাইটলেস বা দ্য ব্লাইন্ড', 'দ্য ইনট্রুডার', 'দ্য সেভেন প্রিন্সেসেস' প্রভৃতি। নরওয়ের জগৎ বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনকে আধুনিক বাস্তববাদী নাট্যসাহিত্যের বা আধুনিক নাটকের জনক বলা হয়। হেনরিক ইবসেনের 'এ ডলস হাউস', 'দ্য ওয়াইল্ড ডাক', 'দ্য মাস্টার বিল্ডার', এবং 'হেড্ডা গ্যাবলার' প্রভৃতি। জার্মান নাট্যকার গেরহার্ট হাউপটম্যান ছিলেন প্রাকৃতিকতাবাদ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরোধা, যিনি ১৯১২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। গেরহার্ট হাউপটম্যানের 'দ্য সানকেন বেল', 'হেনরি অব আউ', 'হ্যানেল' প্রভৃতি। নাট্যসাহিত্যের রুশ (রাশিয়ান) আন্তন চেখভপর 'চেরি বাগান', 'আঙ্কেল ভানিয়া' প্রভৃতি। লিওনিদ আন্দ্রিভের 'দ্য লাইফ অব ম্যান' প্রভৃতি নাটক। বর্তমান কালে সকল শিক্ষিত মানুষের কাছে পরিচিত। তাছাড়া ইয়েটস্, জর্জ কাইজার, ক্যারেল চ্যাপেক ও নীল প্রভৃতি নাট্যকারও পরিচিত। পাশ্চাত্ত্য নাট্যকারগণের মধ্যে হাউপটম্যান এবং আন্দ্রিভের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য বেশি। কারণ রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকে উপরোক্ত দুটি বিপরীত লক্ষণের সমন্বয় দেখা যায়।

মুক্তধারা'র দু'বছর পরে ১৩৩০ বৈশাখে কবি 'রক্তকরবী' লিখলেন। 'রক্তকরবী' একটি বহু আলোচিত প্রশংসিত নাটক। 'রক্তকরবী' ১৩৩৩ সালে (১৯২৬ ডিসেম্বরে) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙ শিলং-এ বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। 'যক্ষপুরী' নামকরণের দ্বারা কবি প্রথমে নাটকটির পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নাটকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, -

> "এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম 'যক্ষপুরী'। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে...।"[২]

পাণ্ডুলিপি আকারে পরে নাম দিয়েছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১-এর আশ্বিন মাসে 'প্রবাসী'তে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার আমাদের জানিয়েছেন যে, ১৩৩০ সালের বৈশাখে শিলং-এ অবস্থান কালে কবি অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মুখে বোম্বাইয়ের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক জীবনের কাহিনী গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেছিলেন। নূতন বোম্বাই সামন্তযুগের অবসান ঘটিয়ে শিল্পযুগের আরম্ভিক পর্বের সূচনা করেছে এই; মিল মালিকদের 'রক্তমাখা দন্তপংক্তি'-র যথার্থ রূপ কবির চোখের সামনে ফুটে উঠল। এই রূপ তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দেখেছেন। কিন্তু এই প্রথম মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বারে তাঁর কবি-মানসকে সচকিত করল 'ঘুমভাঙ্গানিয়া' রুদ্র-কণ্ঠের আহ্বান 'অয়মহং ভোঃ'।

'রক্তকরবী' সম্বন্ধে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'তে বলেছেন, -

> "শিলঙে যে নাটকটি রচনা করেন (১৩৩০) তার প্রথমে নাম দেন 'যক্ষপুরী'; পরে দেন 'রক্তকরবী'। বইখানি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় অনেক কাটছাঁটার পর ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে। ...শিলং হইতে ফিরিয়া কবি দু'দিন নাটকটিকে পড়িয়া শোনান। কবি নিজের লেখার উপর এখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আমরা জানি এবং ছাপাইতেও অবিলম্বে দিলেন বহুবার উহাকে কাটাছাঁটা করেন না"[৩] (রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড)।

দেখা যায় লেখার তিন বৎসর পরে নাটকটি পুস্তকাকারে ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ কিভাবে তাদের মানবিক বৃত্তিগুলিকে জলাঞ্জলি দেয়, পরস্বাপহরণে নির্লজ্জভাবে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়, তার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিচয় কবি নিজের দেশে ইংরাজদের আচরণের মধ্যে পেয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের এই চরম অবনতি তাঁকে কতদূর ব্যথিত করেছিল তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বারবার প্রকাশ করেছেন, -

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি-প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ-বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণার মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাপা কুটে।"[৪] (প্রশ্ন : ১৩৩৮)

রুশ বিপ্লবের সাত বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' রচনা করেন। সেখানে জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রকাশ মুহূর্তে লেনিনের সহসা আবির্ভাব ও নেতৃত্ব গ্রহণের ফলে ঘটনার বেগ ত্বরান্বিত হল এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা জনগণের হস্তগত হল। ইংরেজ লেখক শেলী লিখেছিলেন যে সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তা ছিল নিতান্তই কল্পনা-বিলাস। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের বৈপ্লবিক রূপ দেখেছিলেন; এর ফলে তাঁর চেতনায় গণবিপ্লবের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল, তা ঐতিহাসিক কারণে শেলীর অপেক্ষা আরও অনেক স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, আরও বাস্তবানুগ হতে পারত।

'রক্তকরবী'র ইংরাজী অনুবাদ প্রসঙ্গে নাট্যাকারের স্বয়ং বক্তব্য, -

> "I am not competent to say how Europe herself feels about this phenomenon produced by her science. I can say, on behalf of inarticulate Asia, what a terrible reality for us is the West, whose relation to ourselves is so little human. The view that we can get of her, in our mutual dealings, is that of a titanic power with an endless curiosity to analyses and know, but without sympathy to understand; with numberless arms to coerce and acquire, but no serenity of soul to realize and enjoy."[৫]

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ করে এসে 'রক্তকরবী' নাটক রচনার ঠিক দুই বছর পূর্বে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে (১৩২৮ ভাদ্র, কালান্তর) পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতা সম্পর্কে যে কথা লিখেছেন, -

> "রক্তকরবী'র আন্তর-পরিচয়ের জন্য, তাও আমেরিকা ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যেরূপ দেখেছিলেন, তা কবির মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত ও পীড়িত করেছিল। কারণ কবি ঐ সমাজ ব্যবস্থায় মানব-আত্মার চরম অবক্ষয় এবং আত্মহত্যারই রূপ দেখেছিলেন। তারপর শিলঙ বাসকালে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিল্পাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক শোষণের বীভৎসরূপের বর্ণনা শুনে কবির মনে ঐ বিষয়ে আরও গভীর আলোড়ন ও বেদনার সৃষ্টি করেছে। তাই নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে 'রক্তকরবী' নাটক রচনার প্রাথমিক প্রেরণা এই মনোভাবের মধ্যেই নিহিত আছে।"[৬]

বর্তমান যুগে মানুষ শুধু বাহিরকে জেনে এবং জয় করেই তৃপ্ত নয়, মানুষের দৃষ্টি আজ আপন অন্তরের রহস্যের গভীরেও ন্যস্ত। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় বলতে হয়, -

> "আমাদের চিত্তে এক এক সময় এক একটা কল্পনা অনুভূতির স্পর্শ আসিয়া লাগে, এমন একটা রাজ্যের আভাস আমরা পাই, যাহাকে এই দৃশ্য বাস্তবজগতের সংস্পর্শে আনিয়া রূপ দেওয়া যায় না, যে রাজ্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের সংসারের কোন মিল বা যোগ নাই। অথচ মনের মধ্যে এই অনুভূতি এত তীব্র, এত প্রবল এত সত্য যে কিছুতেই এড়ানো যায় না, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।"[৭]

নাট্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে 'রক্তকরবী'র স্থান অনেকটা 'হ্যামলেট'-এর মতন। নাটকটির সম্বন্ধে তর্কের শেষ নেই, মতান্তরের অবধি নেই। তাই নাটকের 'প্রস্তাবনা'য় সমালোচকদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, -

> "তারা পালাটিকে ছিড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।"[৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এতে নাটকের গূঢ় অর্থের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, অথচ দুজ্ঞেয়তার আবরণে কবি নাটকে যা বলতে চেয়েছেন তা শুধু বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। এই জন্যই অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ এর তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে অনবরত আলোচনা চলেছে; চারু বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আলোচনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপ আমেরিকা এবং পরাধীন ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তায় প্রতিফলন চারটি সংলগ্ন রচনায় - মধ্যযুগীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে 'অচলায়তন', ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 'মুক্তধারা', ধনবাদের মুখোস-খুলে-দেওয়া 'রক্তকরবী', এবং অণ-রুদ্রের জয়ঘোষণা 'কালের যাত্রা'। চারটি মিলে সভ্যতার সংকটপালা।

জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথ কখনও 'রক্তকরবী' অভিনয় করে যেতে পারেননি। তার যে প্রধান কারণটি তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন তা হল, তাঁর পছন্দমতো নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করবার মেয়ে তিনি পাননি। তাই নাটকটি অভিনয়ে উৎসাহ দেখাননি। তবে তাঁর জীবিতাবস্থায় কয়েকবার 'রক্তকরবী' অভিনয়ের উদ্যোগের খবর পাওয়া যায়। ১৯৩০-এর দশকে শ্রীমতী রেবা রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে এই উদ্যোগের একটি খবর পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, -

> "এবার 'রক্তকরবী' অভিনয় করা স্থির। নন্দিনীর ভূমিকা নেবার উপযুক্ত আমি কাউকে দেখচিনে। তুমি যদি এই দায় নিতে রাজী হও তা হলে অভিনয় সম্ভব হবে, নইলে হয় কিনা সন্দেহ।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় নাট্যদল 'রক্তকরবী' অভিনয়ের খবর পাওয়া যায় - ক) ১৯৪৫-এ গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'দ্য নিউ স্টেজ কমিউনিয়ন' দল 'রক্তকরবী' একরাত্রির জন্য অভিনয় করে। খ) ১৯৪৭-এ কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা গণসংগঠন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' প্রথমে কালিকা সিনেমা হল-এ এবং পরে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে 'রক্তকরবী'-র অভিনয় করেছিল। গ) ১৯৫৪-তে বহুরূপীর প্রযোজনায় এবং শম্ভু মত্রের নির্দেশনায় সাড়া ফেলে দেওয়া 'রক্তকরবী'র প্রাথমিক প্রস্তুতি এখানে লক্ষ করা যায়। ঘ) ১৯৮০-তে 'বহুরূপী' থেকে বেরিয়ে আসা অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়' দলটি 'রক্তকরবী' অভিনয় করতে এগিয়ে আসে। অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় নাটকটি অভিনীত হল। প্রথম ১ জানুয়ারি, ১৯৮৪, থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে অভিনীত হয়। ঙ) বহরমপুরের প্রান্তিক গোষ্ঠী 'রক্তকরবী' ১০ আগস্ট, ১৯৭৪-এর বিমল হল-এ মঞ্চস্থ করে। নির্দেশনায় ছিলেন অঞ্জন বিশ্বাস, মঞ্চ-নারায়ণ দাস, আলো-পুরুষোত্তম সোমানি। চ) ১৯৭৮-এ হাওড়া শহরের 'নটধা' গ্রুপ 'রক্তকরবী' রামগোপাল মঞ্চে অভিনীত হয়। নির্দেশনায় শিব মুখোপাধ্যায়। ছ) উত্তর-চব্বিশ পরগনার কাঁচরাপাড়ার পথসেনা নাট্যগোষ্ঠী 'রক্তকরবী' অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দেয়। কাঁচরাপাড়া অঙ্গনমঞ্চে প্রথম ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৬ হাইগুমার্স ইনস্টিটিউট, অভিনীত হয়। জ) কলকাতার 'তৃতীয় সূত্র' প্রযোজনায় প্রথম জুলাই, ২০০৬ 'রক্তকরবী' অভিনীত হয়েছে। নাটকটির সম্পাদনা ও নির্দেশনায় সুমন মুখোপাধ্যায়। ঝ) মনীশ মিত্রের পরিচালনায় ২০০৭-এ অর্ঘ্য নাট্যগোষ্ঠী 'রক্তকরবী'-র অভিনয় শুরু করেছে। কলকাতার পূর্ব-পশ্চিম নাট্যগোষ্ঠীর নতুন প্রযোজনায় রক্তকরবী মধুসূদন মঞ্চে ২৮ আগষ্ট, ২০১০-এ অভিনীত হয়েছে। পরিচালনায় গৌতম হালদার (চিত্র পরিচালক)। অভিনয়ে নন্দিনী-চৈতি ঘোষাল, রাজা-পরিমল মুখোপাধ্যায়।

বাংলাদেশের নাট্য-রসিক সমাজের কাছে 'বহুরূপী' নাট্যদলের 'রক্তকরবী'র অভিনয় নিশ্চয়ই একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটি শিয়ালদহে প্রথম ই বি রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট ১০মে ১৯৫৪ অভিনীত হয়। বহুরূপী প্রতিষ্ঠার ছ'বছরের মাথায় ছোটো বড়ো দশটি নাটক অভিনয়ের পরই তাদের একাদশতম নাট্যপ্রযোজনা 'রক্তকরবী'। এটি কলামন্দির ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫ অভিনয় শেষ হয়। নাটকটি নির্দেশনায় শম্ভু মিত্র, মঞ্চ ও আবহে খালেদ চৌধুরী এবং আলয় তাপস সেন। নাটকটিতে যেসমস্ত দক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অভিনেতৃবর্গরা অভিনয় করেছেন তারা হলেন- নন্দিনীর চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র, কিশোরের ভূমিকায় পরেশ ঘোষ/ প্রজ্ঞা মৈত্র/ রমাপ্রসাদ বণিক, অধ্যাপক চরিত্রে গঙ্গাপদ বসু/ দেবতোষ ঘোষ, রাজার ভূমিকায় শম্ভু মিত্র, গোকুলের ভূমিকায় বেণীমাধব মুখার্জী/ কমল ভট্টাচার্য, ফাগুলাল চরিত্রে মহম্মদ জাকেরিয়া/ শান্তি দাস, চন্দ্রার ভূমিকায় আরতি/ মৈত্র লতিকা বসু, বিশু চরিত্রে শোভেন মজুমদার, সর্দারের ভূমিকায় অমর গাঙ্গুলী, গোঁসাইয়ের চরিত্রে নির্মল চ্যাটার্জী/ কুমার রায়, মোড়ল ভূমিকায় পুলিন বসু/ সমীর চক্রবর্তী, ছোট সর্দার ভূমিকায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমীর চক্রবর্তী/ কালী প্রসাদ ঘোষ, পুরাণবাগীশ : সন্তোষ ব্যানার্জী/ মুকুন্দ দাস, গজ্জু : নিতাংশু মুখার্জী/ নির্মল চ্যাটার্জী, চিকিৎসক : অনিন ব্যানার্জী/ অরিজিৎ গুহ ৩২১, মোড়ল : অমর পাঠক/ বিরিঞ্চি যশ, মেজো সর্দার : নির্মল চ্যাটার্জী/ বিশ্বনাথ মিত্র। এছাড়া অন্যান্য অভিনেতৃবৃন্দরা হলেন - দেবব্রত মুখার্জী, উৎপল ভট্টাচার্য, নমিতা মজুমদার, নিরঞ্জন সরকার, সুকুমার চক্রবর্তী, শঙ্কর ঘোষ, অজয় সেনগুপ্ত, অসীম দে. অতুল সাহা প্রমুখ এঁরা প্রত্যেকে অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যামোদী দর্শক ও সমাজের জ্ঞানীগুণী বিদ্বৎমণ্ডলীদের বহু ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন। এই অনন্য প্রযোজনার জন্য সংস্থাটি সর্বোচ্চ প্রশংসার দাবিদার।

'রক্তকরবী'র কাহিনী ও চরিত্রে বাস্তব জীবনের আলেখ্য বিচিত্রিত হয়েছে। এই চরিত্রগুলি আমাদেরই সুপরিচিত বাস্তবজগতের মানুষ; এরা কোনও স্বপ্নলোকের বাসিন্দা নয়। এদের জীবনে রংও আছে, রাগও আছে; যেমন আকাঙ্ক্ষা আছে, তেমনি আশঙ্কাও আছে। তাই এদের ভাবজগতের ছায়ামূর্তিতে পরিণত করলে, নাটকের অপমৃত্যু ঘটবে, নাট্যকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজা চরিত্রটিতাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার দৃষ্টান্ত। চরিত্রটি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যে অন্তর্দ্বন্দ্বপূর্ণ রূপ নিয়ে চিত্রিত হয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে বাস্তব সত্য ও ভাব-সত্য এই দুই রূপই দান করতে সক্ষম হয়েছেন। 'রক্তকরবী'র রাজা চরিত্রের দুটি রূপ; বহিরঙ্গ রূপে সে ধনতান্ত্রিক শোষণজীবী সভ্যতার প্রতীক আর অন্তরঙ্গ রূপে মানবাত্মার অহং-বিকৃতির প্রতীক। রাজা একটি জালের আবরণের পশ্চাতে বাস করে। এই জাল সহজ যোগের আনন্দময় মুক্তির বাধাস্বরূপ। আর এই বাধার স্বরূপ বাস্তবতন্ত্রের নিরবকাশ সাধনা, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে প্রভূত শক্তিলাভ, মনুষ্যত্বহীন, শোষণজীবী যান্ত্রিক সভ্যতায় আনন্দহীন বদ্ধ জীবন। এই রাজারই শোষণযন্ত্রের চাপে সমস্ত শ্রমিকেরা আজ মনুষ্যত্বহীন জড় সংখ্যা নামায় পরিণত। এই চরিত্রের আদি রয়েছে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে তারপর 'মুক্তধারা'র মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে 'রক্তকরবী'র রাজায় পরিণত হয়েছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের রাজা প্রতাপাদিতা সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকৃত-রাজা, 'মুক্তধারা' নাটকের রণজিৎ সাম্রাজ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিকৃত রাজা আর 'রক্তকরবী' নাটকের রাজা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিকৃত-রাজা। কিন্তু এই রাজার আর একটি অন্তরঙ্গ রূপও আছে। সেখান মানবাত্মা কিভাবে পশুতে পরিণত হয়, তারই মূর্তি পরিস্ফুট। রাজা মনুষ্যত্বের একটি অংশকেই সমগ্র বলে ভুল করেছে, আর সেই ভুলের ফসল কুড়িয়েছে নিজের আত্মাকেই হনন করে। নন্দিনী রাজার এই অদ্ভুত শক্তির প্রশংসা করে, এবং অভিনন্দন স্বরূপ কুঁদ ফুলের মালা তার গলায় পরিয়ে দিতে চায়। কারণ শক্তিই প্রাণকে ধারণ করে। নন্দিনী তাকে প্রকৃতির সৌন্দর্যময় মুক্ত অঙ্গনে আহবান করে। রাজা ও নন্দিনীর কথোপকথনে উঠে এসেছে, -

> "নন্দিনী : তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।
> মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল -
> ঘরেতে আজ কে রগে গো। খোলো দুয়ার খোলো।
> নেপথ্যে (রাজা) : আমি মাঠে যাব? কোন্ কাজে লাগব।
> নন্দিনী : মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।
> নেপথ্যে : সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে। যাও যাও, আর কথা কোয়োনা, সময় নেই।"[১০]

নন্দিনীকে দেখে এবং রঞ্জনের প্রতি তার প্রেমের আকর্ষণ দেখে, রাজা নিজের অপূর্ণতাও বুঝতে পারে। এই অপূর্ণতার জন্য তার অন্তরে বেদনাবোধও আছে। নন্দিনীকে সেও পেতে চায়, কিন্তু যেমন করে নন্দিনীকে পাওয়া যায়, সে পথ তার জানা নেই। রাজা ও নন্দিনীর কথোপকথনে পাই, -

> "নেপথ্যে (রাজা) : যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কি না।
> নন্দিনী : হাঁ, ভালো লাগে।
> নেপথ্যে : রঞ্জনের মতোই?
> নন্দিনী : ঘুরে ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নেপথ্যে : কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী : জাদু বলছ কাকে।

নেপথ্যে : বুঝিয়ে বলব? পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে-সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ঐ প্রানের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।”[১১]

রাজা একবার নন্দিনীকে পাওয়ার জন্য আর্তনাদ করে, আবার পর মুহূর্তেই তার বস্তুনিষ্ঠ মন সেই মায়াপাশ ছিন্ন করে দেয়। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাপোড়েনে রাজা ক্লান্ত; তাই সৌন্দর্যের মধ্যে সে নিজের পশু-সত্তার মৃত্যু কামনা করে। নাটকের শেষে রঞ্জনের মুহূর্তেই রাজার এই মোহজাল ছিন্ন হয়েছে, রাজা তার মুক্ত স্বরূপ ফিরে পেয়েছে। রাজাকে নন্দিনী একটি গান শুনিয়েছে, -

“‘ভালোবাসি ভালোবাসি’
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।”[১২]

ওর সাথী বিশু তাকে এই গান শিখিয়েছে। ‘ভালোবাসি’ এই সুরে কাছে-দূরে জলে-স্থলে বাঁশি বেজে উঠেছে, কিন্তু যক্ষপুরীতে সেই বাঁশি প্রবেশ করে না, সেখানে জীবনের প্রতি অনুরাগপ্রকাশ নিষিদ্ধ, সেখানে যন্ত্ররাজ যন্ত্রের শক্তিতে উন্মত্ত, অতীত সেখানে বিস্মৃত, বর্তমান সেখানে নিষ্ঠুর, আকাশ সেখানে কলঙ্কিত, মৃত্তিকা সেখানে স্বর্ণপিণ্ড মাত্র। কিন্তু যক্ষপুরীর বাইরে উন্মুক্ত পৃথিবীতে উঠেছে জীবনের গান, -

“সেই সুরে সাগর কূলে
বাঁধন খুলে
অতলরোদন উঠে দুলে
সেই সুরে বাজে মন
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা-দিনের কাঁদনহাসি।”[১৩]

এ গান রাজা সহ্য করতে পারেনি। অন্ধকার-নেপথ্যবর্তী প্রতাপমত্ত রাজার চিত্তের অতীতের সহজ জীবনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার জন্য এই গানটির প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে বিলাতের ‘ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান’-এ প্রকাশিত ও ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে ‘বিশ্বভারতী কোয়াটারলি’ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ থেকে হিরণকুমার সান্যাল উদ্ধৃত করছেন, -

> “এ রাজা মানুষ নয়, আমলাতন্ত্রের শাসন ও শিল্পপতিদের শোষণ, এই দুইয়ে মিলে যে অমানুষিক শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, রক্তকরবীর রাজা তারই অদৃশ্য বিমূর্ত বাহন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই নৈর্ব্যক্তিক অমানুসিকতাও মানুষ হয়ে উঠে নিজেরই বিরুদ্ধে। বিদ্রোহের জয়ধ্বজা ওড়ান শাসনের ধ্বজদণ্ড নিজের হাতে ভেঙে। রঞ্জনকে মেরে রাজা নিজের শক্তি খুইয়ে অর্জন করেন রঞ্জনের প্রাণশক্তি। এ এক অদ্ভুত অবাস্তব ব্যাপার। ইতিহাসে কখনও এরকম ঘটনা ঘটেনি। যেকোন সমাজ, যে-কোন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে যে-অন্তর্নিহিত স্ব-বিরোধ আছে তারই প্রভাবে যে এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে তা বলে এক্ষেত্রে পার পাওয়া শক্ত, কেননা রক্তকরবীর রাজা সমগ্র সমাজব্যবস্থার নয়, একটি মাত্র শাসক ও শোষক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও নেতা, ...এহেন রাজা যখন লড়াইয়ে যান তখন তুর্য না বেজে মাঠের বাঁশির সুরে আকাশ পাগল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু লড়াইয়ে যারা রাজার অনুচর, পৌষের ডাক তাদের মনে তখন আর কী সাড়া জাগাতে পারে?”[১৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শম্ভু মিত্র আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। বাচনভঙ্গীর রাজকীয় আভিজাত্যে, উচ্চারণের স্পষ্টতায়, কণ্ঠস্বরের মার্জিত গাম্ভীর্যে এবং দুর্নিবার আকর্ষণীয়তায় তাঁর সঙ্গে এখনকার কোনো অভিনেতারই তুলনা হয় না। তাঁর এই ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠকে তিনি অনবরত পরিচর্যা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সতেজ ও সক্রিয় রেখেছেন। শম্ভু মিত্র এভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করেছেন। 'রাজা ওয়েদিপাউস' এবং 'রক্তকরবী'র রাজার অভিনয়ে শম্ভু মিত্র দাঁড়াবার ভঙ্গি, দুই পায়ের বিস্ফারণ, হাতের প্রসারণ এবং গ্রীবার ঈষৎ হেলনের মধ্য দিয়ে তাঁর দেহকে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ক'রে তোলেন।

রক্তকরবীর অভিনয় প্রসঙ্গে স্বয়ং শম্ভু মিত্র বলেছেন, -

> " 'বহুরূপী'র ঐ সংখ্যাতেই, আমাদের রক্তকরবী ভাল লাগে। যেমন অনেকেরই লাগে! অনেক বারই আমার মনে হয়েছে যে ওটা অভিনয় করি। আবার প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে যে আমরা পারব না। আমাদের পক্ষে এ কাজ কঠিন, তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী বহুরূপীতে এলেন এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা, আঁকতে পারেন, যে কোন বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, আর যতো নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় রক্তকরবীর চিন্তা পেয়ে বসল।"[১৫]

রবীন্দ্র অনুকার-সিদ্ধ দর্শকেরা সেই অভ্যন্তে বেশ-ভূয়া, মঞ্চসজ্জা, প্রভৃতিও এই রূপায়ণে দেখতে পাননি, সেই শান্তিনিকেতনের সুর করে বলা কথাও শুনতে পাননি। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদার তাঁর 'রক্তকরবী'র রূপান্তর'-এ লিখেছেন,-

> "শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র যা করতে চেয়েছেন। তা অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের নকল নয়, রবীন্দ্রানুপ্রেরণায় নূতন সৃষ্টি। এজন্যই কবির তিনি আশীর্বাদভাজন হতেন। 'রক্তকরবী'-কে কবি প্রাণদান করেছেন, কিন্তু রক্তকরবী জীবন্ত হয়ে উঠেছে প্রযুক্ত শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায়।"[১৬]

'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনী চরিত্র রবীন্দ্রনাথের রূপক সাঙ্কেতিক ধর্মীতা তথ্য স্বভাব ভাববাদেরই পরিচয় বহন করে। নাট্যকার কিছুতেই নন্দিনীকে প্রতীক বলে স্বীকার করতে রাজী নন, তার কথায় রক্তকরবী নাটকটি 'নন্দিনী নামে একটি মানবীর ছবি'। আসলে 'রক্তকরবী' নাটকটি 'মানুষ উদ্ধারের পালা'। একদিকে রাজা আর তার অনুচরগণ, অন্যদিকে অগণিত শ্রমিকসমাজ, এই অপ-মানুষ ও অব-মানুষদের বিকৃতি থেকে উদ্ধার করে সহজ যোগের আনন্দময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়েই যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আবির্ভাব। নন্দিনী যেন ঐ সব বিকৃত মানুষদের মুক্তিমন্ত্রদাত্রী।

নন্দিনী লীলাময় প্রাণের প্রতীক। প্রাণের এই লীলার প্রকাশ সহজ আনন্দে; আর আনন্দের সার্থক অভিব্যক্তি সৌন্দর্যে, প্রেমে, এবং সর্ব-বন্ধনহীন মুক্তির মধ্যে। নন্দিনী সৌন্দর্য-প্রেম-মুক্তিস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তি। এই প্রাণের লীলা মূর্ত হয়ে উঠে যৌবনের দুর্দম শক্তির মধ্যে। যৌবনের বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যেই প্রাণ তার আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা এবং শক্তি লাভ করে। তাই রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ, রঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাই নন্দিনীর এত উৎকণ্ঠা ও আকাঙ্ক্ষা। আর নন্দিনীর স্বরূপের প্রতীক 'রক্তকরবী'। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নন্দিনীর কথা বারবার শুনিয়েছেন, -

> "এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল, প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কি করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তা বর্ণিত আছে। নন্দিনীর উপস্থিতিই আঘাত করেছে যন্ত্রকে, যক্ষপুরীর মকররাজকে।"[১৭]

মানবীরূপ পাওয়ায় নন্দিনী তার আচার-আচরণে রক্ত-মাংসকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেনি; তত্ত্বগত অর্থ গভীরে নিমজ্জিত থাকলেও বাইরের একটা সাধারণ অর্থও একেবারে শূন্যে মিলিয়ে যায়নি।

নন্দিনী এ যুগের মানবী এবং সেই সঙ্গে চিরকালীন নারী সত্তা; কিন্তু একটা জীবন্ত মানুষ হয়েও চিরকালীন মানব-বেদনার প্রতীকও বটে। 'রক্তকরবী' নাটক-সর্বকালীন মনুষ্যত্বের আবাহনের নাটক, সেই মহতী লক্ষ্যের সংকেত করেছে এই নাটকের কাহিনী; সেই অর্থে এটা সত্যমূলক। বাস্তব সত্য কোন এক বিশেষ সময়ের এবং স্থানের, কিন্তু কাব্যের সত্য স্থানকালের সীমাকে অতিক্রম করে চলে যায় চিরন্তন সত্যের রূপ লাভ করে। তাই কবির মুখেই শোনা গেল, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এই ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের উপরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। ঘটনাস্থান সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কি সে সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুরী।"[১৮]

মকররাজ কেবল যক্ষপুরীর রাজাই নয়-সর্বযুগেই তার জড়বাদী হাত মানবাত্মাকে নিষ্পেষিত করতে চেয়েছে এবং কোনদিনই সে সাফল্যলাভ করেনি।

নন্দিনীর চরিত্রের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশী নজরে পড়ে, সে তার আত্মনিষ্ঠ সজীব মননশীলতা, যার সংস্পর্শে যে-ই আসে তারই মন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। এইখানে অন্য চরিত্রের সঙ্গে তার প্রভেদ। অন্য চরিত্রগুলি প্রতীকী, সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধি। কিন্তু নন্দিনীর চরিত্রে সেই ইশারা পরিব্যাপ্ত, যা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণসঞ্চার করে, জীবনীশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। সে যেখানে যায় নিয়ে যায় প্রাণের তরঙ্গ; সমস্ত পরিবেশ তার আগমনে চঞ্চল হয়ে ওঠে; তাকে অপছন্দ করা সম্ভব, উপেক্ষা করা অসম্ভব।

চিৎশক্তির দুটো দিক আছে। একদিকে সে রসজ্ঞ, জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপভোগ করবার জন্য উন্মুখ। অপর দিকে সে ভাবজ্ঞ, চেতনার সাহায্যে সে জানবার প্রয়াসী; পর্যায়ক্রমে উন্মেষিত নবজীবনের রহস্য সন্ধানে তার সমস্ত শক্তি অনর্গলিত। তাই সে যেমন রস সৃষ্টি করে, তেমনি মনের মধ্যে কৌতূহল সঞ্চার করে। সে মায়াবিনী, বীরকে ভাবাবিষ্ট করে, অনুপ্রাণিত করে; সে বীর্যবতী, ভীরুকে ধিক্কার দেয়। এক কথায় নন্দিনী মনের সেই সঞ্জীবনী শক্তি যা মানুষের মননশীলতাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমান থেকে মানুষকে উদ্ধার করে এবং সাহিত্যে শিল্পে নবচেতনা জাগিয়ে দিয়ে আমাদের নিত্যসম্মুখগামী চলার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। এই জন্য যক্ষপুরীর সর্বত্র তার অবাধ গতি; সে সর্দারদের রবীন্দ্রনাথ চিরদিন এই জাগ্রত চিৎশক্তির পূজারী; এরই উদ্দেশে তিনি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'সবুজের অভিযান' কবিতায় লিখেছিলেন তাঁর অপূর্ব ভাববিমূর্ত ভাষায়, -

"বাহির-পানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে-
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা। মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়।
আয় অশান্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, একী বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুষের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।"[১৯]

এখানে জরাজীর্ণতা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তারুণ্যের গতিশীল শক্তিকে আবাহন করা হয়েছে। নন্দিনীর প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারী-শক্তির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী ক'রে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাঁধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে Hindustan Standard-এর নিজস্ব সংবাদদাতা মন্তব্য করেছেন, -

> "Tripti Mitra gave a warmly intimate study of Nadini and the great actress as she is, Rabindranath's priceless dialogues seemed to gain a new grandeur and significance in her mouth... Sambhu Mitra... remarkably conveyed to the audience the conflict of emotions of a character not seen by the audience. This can truly be called acting 'per excellence'. Other characters... fitted themselves into the overall dramatic pattern in fine manner. The decor of the drama's single set together with the various background effect considerably heightened the play's dramatic value and also bore testimony to Bohurupee's excellent taste in stagecraft."[২০]

রক্তকরবী নাটকের বিশু চরিত্রটি রবীন্দ্র-নাট্য প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই জাতীয় চরিত্র রবীন্দ্রনাথের সকল সাঙ্কেতিক নাটকেই বর্তমান। বিশ্ব চরিত্র অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা-জাতীয় চরিত্র, ঠাকুর্দা, ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতি চরিত্রের সমগোত্রীয়। এরা ভাবের পাগল, বিশু নন্দিনীর 'পাগল ভাই'। কিন্তু পাগল হলেও এরা জ্ঞানী, আনন্দপ্রাণ ও মুক্তপুরুষ।

বিশু চরিত্র একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভাবসত্যের মূর্তি, অন্যদিকে তেমনি নাটকের কাহিনি ও ঘটনার সঙ্গে বিশেষ ভাবেই জড়িত। এ জীবন থেকে মুক্তির জন্য বিশু ব্যাকুল। কিন্তু নিজের শক্তির উপর সে হারিয়ে ফেলেছে বিশ্বাস। এমন সময় যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আবির্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে বিশুরও জাগরণ। নন্দিনীকে দেখে সে বলে, -

> "যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি মনে হয়, জীবন হতে আমরা আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত এখানকার টুকরা মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিন্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনও আলো আছে।"[২১]

অসীমের রহস্য এবং আনন্দের স্বরূপ বিশু নন্দিনীর মধ্যে দেখেছে। নন্দিনীই বিশুকে বন্ধনমুক্তির পথ দেখিয়েছে।

বিশু 'রক্তকরবী'র অন্যতম শ্রমজীবী। সে যক্ষপুরীর হতাশ অন্ধকারে জীবিকার নিয়তিতে আবদ্ধ, যদিও জীবনের স্বরূপ তার কাছে অজ্ঞাত নয়। সে 'রঞ্জনের ওপিঠ-যে পিঠে আলো পড়ে না'। তার হৃদয়ে যন্ত্রণা, কিন্তু কণ্ঠে গান এখনো মরেনি। নাটকের দৃশ্যসূচনায় বিশুর বিশুর কণ্ঠে প্রথম গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে আবির্ভাব, -

"মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে!
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগল পরান চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।"[২২]

স্পষ্টতই এ গান নন্দিনীর প্রতি উদ্দিষ্ট। বিশু কেবল পাগল নয়, সে কবিও। অসীমের যে রহস্যদূতী দূরান্ত থেকে ক্ষণে ক্ষণে সীমার বাতায়নে উঁকি দিয়ে যায়, বিশুর জাগ্রত চৈতন্য তাকে ধরার চেষ্টা করে। তাই তার দ্বিতীয় গানের মধ্য দিয়ে জানিয়েছে, -

"তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব বন শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে।"[২৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই ছোট গানটি যক্ষপুরীর নিরানন্দ গহ্বরে কর্মপিষ্ট মুমূর্ষু মানুষগুলির মরণের মুখে ধাবিত আর্তনাদ মাত্র। এ গানের ব্যাখ্যা বিশুই করেছে, -

> "আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ। তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি এক চুমুকের তরল আগুনে।"[২৪]

বিশুর কণ্ঠে শ্রেষ্ঠ গানটির মধ্য দিয়ে জানিয়ে দেয়, -

"তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ ওগো ঘুমভাঙানিয়া!
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগনিয়া!
এল আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া!"[২৫]

বিশুর জীবনবেদ, 'রক্তকরবী'র রুদ্ধশ্বাস শোষণযন্ত্রণার মধ্যে নিরাশ্বাস' জীবনের শেষ অমৃতপিপাসা। এই গানের গোপন ব্যথায় নন্দিনী বিশুর মনের খবর পায়। তারা দুঃখের দোলনচাঁপা হঠাৎ যেন সুরের সুবাস ছড়িয়ে দেয় নন্দিনীর মনে।

একদিন বিশু ছিল দুঃসাহসী রঞ্জনেরই দলে। একটি মেয়ে তাকে স্বর্ণের প্রলোভনে এই সুড়ঙ্গ খোদাই করার কাজে টেনে আনল। সেই থেকে তৃষ্ণার জল তার কাছে আশার অতীত হয়েছে। বিশু এখন নিঃসঙ্গ, সকাল তার কাছে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট, জীবন থেকে আকাশখানা সে হারিয়ে ফেলেছে। এমন সময় এল নন্দিনী, এল তার 'দুখজাগানিয়া'।

"আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুখজাগানিয়া।"[২৬]

যেন চাঁদের টানে লাগল জোয়ার, হৃদয়ের তারে বাজলো চাপা ব্যথার মীড়, চোখের জলে পড়ল সূর্যের ঝলক। সেই অনির্বাচনীয় অনুভূতি গীতরূপ বিশু কণ্ঠে, -

"ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।"[২৭]

বিশুর 'পথচাওয়ার গান'। প্রেমের এই জন্মান্তরীণ পথচাওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনেরই একটি স্থিরপ্রত্যয়।

রক্তকরবীর মূল নাট্যদ্বন্দ্বে বিশুপাগল এমন একটি পাত্র যে প্রলোভনেও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে রাজী নয়। শাস্তি পেয়েও সে চিত্তধর্ম হারাবে না। তা ছাড়া নন্দিনী-রঞ্জনের সঙ্গে প্রণয়সূত্রে তার অতীতকালের সংযোগও তাকে কিছু গুরুত্ব দিয়েছে। তত্ত্বের রাজ্যে তার সেই পরিচিতি কিন্তু মানসরসের উপাদান এনেছে। গানগুলির মধ্যদিয়ে চিরকালীন প্রেম-বিরহ-ব্যাকুলতার এক রহস্য-বিজড়িত সুর মূর্জিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে জীবন-সত্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যার চরিতার্থতায় যন্ত্রসর্বস্বতার অভিশাপ থেকে মনুষ্যত্বকে বাঁচানো যেতে পারে, দুঃখচেতনা ছাড়া তার অপূর্ণতা ঘোচে না। যন্ত্ররাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রঞ্জনের ন্যায় বিশুও কঠিন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যোদ্ধা। কিন্তু একদিকে যৌবনের উল্লাস, অন্যদিকে বস্তুসম্পর্কাতীত দুঃখবোধের নিতল গভীরতা। বিশু তাই রঞ্জনের অপর পিঠ।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রধান ভিত্তি যে জড়-বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবুদ্ধি, অধ্যাপক চরিত্রটি তারই প্রতীক। তার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি এই সমাজ-ব্যবস্থার শাসন ও শোষণের কৌশল ও তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত। সকল কিছুকে বস্তু হিসাবে জানা ও পাওয়াই এদের লক্ষ্য। আনন্দের বা মুক্তির কোন অবকাশ নেই এর জীবনে। মকররাজের ভাষায় এই অধ্যাপকের—

> "জগতে যা-কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুবিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে। এখন থেকে থেকে রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর-একটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায়?' ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক-আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক।"[২৮]

'রক্তকরবী'র সর্দার চরিত্রের দুইটি রূপ। বহিরঙ্গ রূপক-রূপে সে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র। শোষণ ও শাসনের সাধনার যে নির্বিকার নির্মম, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড যে কোন কৌশলে ঐ শাসন ও শোষণকে অব্যাহত রাখতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প। রাজার সৃষ্টি এই সর্দার আর রাজার অভিপ্রায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই নাটকের পরিণতিতে রাজাকে এর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহে অগ্রসর হতে দেখা যায়।

সর্দার অন্তরাত্মার বিকৃতির প্রতীক, জড়-শক্তির জলে আসৃত। জীবনের আনন্দ ও মুক্তি সে উপলব্ধি করতে পারে না। নির্মম শাসন ও শোষণে মত্ত হয়ে সে নিজেও প্রাণহীন জড়ে পরিণত। নন্দিনী ও বিশুর কথোপকথনে উঠে এসেছে, -

> "নন্দিনী : ঐ দেখো পাগলভাই, ঐ ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেছে।
> বিশু : এখানে তো চার দিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী? সর্দারকে কেমন লাগে?
> নন্দিনী : ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে।
> বিশু : প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।
> নন্দিনী : চুপ করো, শুনতে পাবে।"[২৯]

সর্দারেরই প্রতিপক্ষ নন্দিনী। কারণ যক্ষপুরীতে নন্দিনী এনেছে বিদ্রোহের মন্ত্র। তাই সর্দার নন্দিনীকে বলেছে, -

> "এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে-আমাতে। বেশি দেরি নেই।"[৩০]

সত্যিই নন্দিনীর প্রভাবে যক্ষপুরীর অন্য সকলের পরিবর্তন হলেও সর্দারের কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং শেষ পর্যন্ত রাজা ও শ্রমিকগণ নন্দিনীর মন্ত্রে সেই সর্দারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

গোঁসাই চরিত্রটি ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থসাধনের অন্যতম অস্ত্র স্বরূপ। ইনি ধনতন্ত্রের প্রসাদলোভী ধর্ম প্রচারক ও নীতি উপদেষ্টা। অধর্মকে শাস্ত্রের বচনের আড়ালে ধর্ম বলে চালানোই গোঁসাই-এর কাজ। শোষিত শ্রমিকেরা যাতে বিদ্রোহ না করে, সেইজন্য পরকালের ভয় এবং পুণ্যের লোভ দেখিয়ে তাদের ক্ষোভকে প্রশমিত করাই তার কাজ। তা গোঁসাই-এর এই উক্তিকেই স্পষ্ট হবে যে, -

> "বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়নড়ে করছে, মূর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল বলে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তারপরে আমাদের পালা। তবে আসি।"[৩১]

গোঁসাই এর ভন্ডামি এবং নীচতা কতদূর তার প্রমাণ এই উক্তি, -

> "আহা, এরা তো স্বয়ং কুর্ম-অবতার। বোঝার নীচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে নামবিলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই।”[৩২]

চন্দ্রা গোঁসাই-এর ভণ্ডামি ধরতে না পারলেও, ফাগুলাল বোঝে। বিশু এর বিরুদ্ধে সর্দারকে জানায়, -

> “গোঁসাইজি এদের কুর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কুর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।”[৩৩]

‘রক্তকরবী’ নাটকের প্রতীক চরিত্রের একঘেয়েমির মধ্যে ফাগুলাল এবং চন্দ্রা চরিত্র দুটি বহুলাংশে বাস্তব। ফাগুলাল ও চন্দ্রা স্বামী-স্ত্রী। ফাগুলাল সরল কিন্তু গোঁয়ার প্রকৃতির। যক্ষপুরীতে খোদাই করে জীবিকার বহু বৎসরের অভ্যস্ত হলেও, সে অন্যান্য শ্রমিকদের মতো নিষ্প্রাণ সংখ্যায় পরিণত হয়নি। যক্ষপুরীর জীবন যে আনন্দহীন, এবং কীভাবে শ্রমিকদের শোষণ করা হয়, সে সম্পর্কেও সে সচেতন। সত্য কথা সে মুখের উপরস্থলে, স্থান-কাল-মাত্র বিবেচনা করে না, এর জন্য তাকে অনেক সময়ই শাস্তি পেতে হয়। ফাগুলাল ও সর্দারের মধ্যে কথোপকথনে উঠে আসে, -

> “ফাগুলাল : এখন সন্ধ্যেবেলায় মদ খেয়ে বড়ো জোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।...
>
> সর্দার : এই যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন-ভারি দরকার।...
>
> ফাগুলাল : প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।”[৩৪]

শ্রমিক-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ফাগুলাল। নাটকের শেষে সেও বীরত্বের সঙ্গে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছে। নন্দিনীর প্রভাবেই তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। আর চন্দ্রা দোষেগুণে সমন্বিত একজন সাধারণ নারী। সাধারণ নারীর মতোই সে নন্দিনীকে ঈর্ষা করে, স্বামী ফাগুলালকে নন্দিনী সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। আবার সাধারণ নারীর মতোই সুখের প্রতি লোভ আছে। সকল ধর্ম-বিশ্বাসেই গোঁসাইকেও বিশ্বাস করে। গোঁসাইকে ফাগুলাল কটু উক্তি করলে, সে ফাগুলালকে তিরস্কার করে। এই সকল দিক থেকে চন্দ্রা একজন সাধারণ নারীর জীবন্ত মূর্তি হয়ে উঠতে পেরেছে।

‘রক্তকরবী’ নাটকের আরম্ভ কিশোর ও নন্দিনীর সাক্ষাতে। কিশোর চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কৈশোর জীবনকে রূপ দিয়েছেন। রঞ্জন পূর্ণ যৌবন-শক্তি ও আনন্দের প্রতীক, কিশোর চরিত্র এই রঞ্জনেরই কৈশোর অবস্থার রূপ। কৈশোর স্বভাবোচিত কৌতূহল, ব্যাকুলতা এবং নিয়মকে অস্বীকার করবার প্রবণতা কিশোর চরিত্রে পরিস্ফুট। নন্দিনীর সংস্পর্শে সেও মুগ্ধ। কিশোর ও নন্দিনীর কথোপকথনে পাই, -

> “কিশোর : নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!
>
> নন্দিনী : আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর আমি কি শুনতে পাই নে।
>
> কিশোর : শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার-যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তা হলে আনতে যাই।
>
> নন্দিনী : যা যা, এখনই কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।...
>
> কিশোর : অমন কথা বলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হোয়ো না। ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।
>
> নন্দিনী : কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার-যে বুক ফেটে যায়।
>
> কিশোর : সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।”[৩৫]

অন্তরের সুরেই সে নন্দিনীকে ডাকে। এই ডাকার মধ্যেই প্রকাশিত তার বিস্ময় ও ব্যাকুলতা। তাছাড়া সর্দারদের হাতে শাস্তিরও ভয় আছে কিশোরের। কিন্তু ডাকার জন্য এবং কাজ ফাঁকি দিয়ে নন্দিনীর জন্য রক্তকরবী ফুল সংগ্রহের অপরাধে নিজের শাস্তির ভয়কে অগ্রাহ্য করেও সে ঐ কাজ করতে চায়। কারণ এই কাজেই কিশোরের আনন্দ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

'রক্তকরবী' স্পষ্টতই কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এ দ্বন্দ্ব কৃষিনির্ভর সভ্যতার সঙ্গে যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার। যন্ত্র তো বর্তমানকালের আবিষ্কার। তবে কি এই দ্বন্দ্ব বর্তমানের? রবীন্দ্রনাথ সে কথা স্বীকার করেন নি। কৃষিনির্ভর সভ্যতা বলতে তিনি প্রাণের উদ্যমকে বুঝিয়েছেন - যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা বলতে বুঝিয়েছেন জড়বাদীর সঞ্চয় প্রচেষ্টা। কবির মতে, -

> "আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই। মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।"[৩৬]

রাম-রাবণের বিরোধের মধ্যে সেই চিরকালীন সমস্যার তৎকালীন রূপ তিনি দেখেছেন। রামায়ণের সমস্যাকে তিনি রক্তকরবীরও সমস্যা বলে মনে করেন। বর্তমানের পুঁজিবাদী সভ্যতা নবদূর্বাদল সদৃশ কৃষিক্ষেত্রকে ধ্বংস করে প্রসারিত করেছে শিল্পক্ষেত্র, হরণের কাজে টেনে নিয়ে চলেছে কৃষিপল্লীর মানুষগুলোকে। এই শোষণজীবী সভ্যতার রূপটা রাক্ষসেরই ন্যায়। সেকালের সেই দ্বন্দ্ব আর একালের এই দ্বন্দ্ব স্বরূপত একই। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনও চিরকালীন সত্য; সমাজ তাই নূতন থেকে নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। চিরন্তন সত্যের নানা রূপের প্রকাশ ঘটেছে 'রক্তকরবী' নাটকে।

The Statement-এর নিজস্ব সংবাদদাতা সমালোচনা করে অভিনীত শিল্পীদের প্রসঙ্গে লিখেছেন, -

> "Watching Tripti Mitra as Nandini an forgot 'o remembers if she was beautiful, so attractive was her performance. Another man without Sambhu Mitra's vocal range and power of elocution could hardly have given more life to the part of the King. who King, who remains invisible most of the time. Fagulal, Chandra, Gokul Gokul, Adhyapak Gosain and the Sardars, each of them fitted admirably into their places, together with characters of smaller Importance. Bishu made up for Diack of finesse in robustness."[৩৭]

নন্দনতত্ত্ব বলতে সৌন্দর্যতত্ত্ব বোঝায়; রবীন্দ্রনাথ সেই কারণেই নন্দিনীকে এবং সজীব প্রাণের প্রতীক করে সৃষ্টি করেছেন রক্তকরবীর আভরণ সেই প্রণের দ্যোতনা করে। সৌন্দর্য সকল মানুষের মনকেই কোন-না-কোন সময়ে স্পর্শ করে।

'রক্তকরবী' নাটকে রক্তকরবী গাছেরও উল্লেখ আছে, তার সন্ধান কিশোর জানে, এই গাছটি একান্তই যার গোপন সংবাদ। নন্দিনীর প্রতি এক এক জাতীয় প্রাণের আবেগও এই নাটকে কয়েকটি চরিত্রের গোপন সংবাদরূপে দেখা দিয়েছে। চন্দ্র বলেছে, বিশুকে নন্দিনীতে পেয়েছে। কেবল বিশু নয়, নাটকের অধিকাংশ চরিত্রই অল্পবিস্তর নন্দিনীর দ্বারা আবিষ্ট। রক্তকরবীর লাল রঙ একাধিক চরিত্রের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপকের মনে হয়েছে, নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর আভরণের কিছু একটা মানে আছে। এই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে। অধ্যাপক, নন্দিনী ও গোকুল-এদের কথাবার্তায় উঠে এসেছে, -

> "অধ্যাপক : সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি; সব বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে। জান, মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয়?
>
> নন্দিনী : রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।...
>
> গোকুল : দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান।"[৩৮]

নন্দিনীর কাছে রক্তকরবীর অন্য একটি অর্থ আছে। নন্দিনীও নাটকে দুই উদ্দেশ্যের প্রতিনিধি-রঞ্জন তথা যৌবনের প্রতি প্রাণের প্রেম এবং যক্ষপুরীর অবরুদ্ধ মানুষগুলির কাছে মুক্তির প্রেরণা। এই দিক থেকে নন্দিনীও রক্তকরবী। জানালার আড়াল থেকে রাজাও ঐ ফুলের সন্ধান রাখেন। তিনি বলেছেন, -

> "ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয় ওই যেন আমারই রক্ত-আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনদিন নিজের হাতে ঐ মঞ্জরী আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তাহলে হয়ত আমি সহজে মরতে পারব।"[৩৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নাটকের শেষ দৃশ্যগুলিতে রক্তকরবী কেবল ফুল নয়, একটি চরিত্রে পরিণত হয়ে কিশোর রক্তকরবী ফুল গোপনে সংগ্রহ করতে গিয়ে রাজার প্রমত্ত শক্তির দ্বারা চূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হাতে বেঁধে রেখেছে রক্তকরবীর মঞ্জুরী। এই ফুল দিয়েই সে রাজার ঔদ্ধত্যকে আঘাত করতে গিয়েছিল। তারপরই বেধেছে চরম লড়াই। ফাগুলাল ও বিশু বিপ্লবের অভিনেত্রী নন্দিনীর জয়ধ্বনি দিয়েছে। কিন্তু নন্দিনী তখন ধুলোয় রক্তকরবী লুটিয়ে আত্মদান করেছে। মানুষ নন্দিনীর মৃত্যু হলেও ঐ ফুলই তার প্রাণরূপ, তার আনন্দরূপ। এইজন্যই কবি বলেছেন, -

> "নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতি সম্ভাষণ জানাতে এল। সে বললে, ভাই মরিনি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল। নাটকটাকে তাই যক্ষপুরী নন্দিনী প্রভৃতি বলে আমার মন। তৃপ্ত হয়নি, তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।"[৪০] (প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহে উদ্ধৃত কবির মন্তব্য)

নাটকটির নির্দেশনা, মঞ্চের বাইরের সঙ্গীত ও অন্যান্য আবহ, দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাত প্রসঙ্গে স্টেটম্যান পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা সমালোচনায় লিখেছেন, -

> "The piquant but immensely utilitarian decor, the artistic lighting and intelligent use of darkness, the offstage musical and other effects and the perfectly keyed up team filled for two hours (without a break) the dimness of the theatre with the electric quality that is only found when every person of an audience is an enthusiast..."[৪১]

রক্তকরবী নাটকের মধ্যে একমাত্র রাজা চরিত্রটিই তার অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে রক্ত-মাংসের জীবন্তকল্প মানুষ হয়ে উঠেছে। তবে নন্দিনীর প্রতি তার আকর্ষণের রূপটি তাত্ত্বিক দিক থেকে বোঝা গেলেও, বাস্তবজীবনের দিক থেকে খুব স্পষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে নাট্যশিক্ষক উৎপল দত্ত 'বহুরূপী ও রক্তকরবী'-তে লিখেছেন, -

> "রক্তমাংসের মানুষ 'রক্তকরবী'তে নেই- আছে নানা আইডিয়ার দেহপ্রাপ্ত মূর্তি। যেমন রাজা বোধ করি মানুষের অন্তরতম মুক্ত আনন্দময় সত্তার প্রতীক, যাকে ধনতন্ত্রের এবং পশুশক্তির দম্ভ একটা জালের রূপ ধরে বন্দী করে ফেলেছে; নন্দিনী লীলাময় প্রাণের প্রতীক; রঞ্জন যৌবনের প্রতীক এবং - যৌবনকেই হত্যা করে করে রাজার জীবন অভিশপ্ত হয়ে গেছে। এরকম সবাই। শম্ভুবাবুর সাহসিকতার পরিচয় এখানেই - রূপক বজায় রেখে চরিত্রগুলিকে সাংকেতিকতার গুরুভার থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন।"[৪২]

নাটকে নন্দিনীকেও কবি প্রেমের, সহজ সুখের ও সহজ সৌন্দর্যের লীলাময়ী, জ্যোতির্ময়ী, কবিত্বময়ী নারীরূপে চিত্রিত করেছেন। নন্দিনীই এই নাটকের প্রাণকেন্দ্র। আর এই প্রাণের ও প্রেমের, আনন্দের ও সৌন্দর্যের রূপটিকে বিশুদ্ধভাবে দেখানোর উদ্দেশ্যে কবি রক্তকবীর অবতারণা করেছেন এবং নন্দিনী ও রক্তকরবীকে নাটকীয়ভাবে একাকার করে দিয়েছেন।

নাটকটির নির্দেশনা, মঞ্চ, আবহ, দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাত প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখেছেন,-

> "সমস্ত ক'জন অভিনয় শিল্পীই, ছোট বড় সব চরিত্রাভিনয়েই এবং বিশেষ করে নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র ও নেপথ্য থেকে রাজার ভূমিকায় স্বরাভিব্যক্তিতে শম্ভুমিত্র যে নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছেন তা আর কোন দলের কারুর সম্পর্কে ভাবা যায়না। ...তাপস সেনের আলোকসম্পাত ও আবহাওয়ার যথাযথ রূপ ফুটিয়ে তুলে একটা শক্তিশালী ভূমিকারই অভিনয় করে গিয়েছে। দৃশ্যসজ্জার জ্যামিতিক রেখার সটান চেহারা দৈত্যপুরীর একটা নিরেট রূপ ফুটিয়ে তুলেছে।"[৪৩]

রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে 'রাজা ও রাণী' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক। শাস্ত্রীয় প্রথা ও বর্ণগত অহমিকার বিরুদ্ধে 'বিসর্জন' ও 'মালিনী', অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্যর বিরুদ্ধে 'চণ্ডালিকা', সাম্রাজ্যাবাদী শাসন ও যন্ত্রের ভয়াবহ শক্তির বিরুদ্ধে 'মুক্তধারা' নাটকে, ধনতন্ত্রী শোষণের বিরুদ্ধে 'রক্তকরবী' নাটকে নাট্যকণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকই বাংলা নাটককে বিশ্বনাটকের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে যন্ত্রের একাধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ইত্যাদি যে সব সমস্যার অবতারণা করেছিলেন সেগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইওরোপ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও আমেরিকায় প্রকাশবাদী নাটকগুলিতে দেখানো হয়েছিল। সমস্যাগুলি কোনো বিশেষ দেশের সমস্যা নয়, সেগুলি হল বিশ্ব সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে, বহুরূপী কর্তৃক পরিবেশিত 'রক্তকরবী' বাংলার নাট্যজগতে এটি একটি মাইলফলক।

Reference:

১. চৌধুরী, দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, ১ম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ. ৩৪১
২. ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী': পরিক্রমা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ১ম প্রকাশ জন্মাষ্টমী, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ২৭
৩. ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী'র তত্ত্ব ও তাৎপর্য, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, ১ম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৫৯, কলকাতা, পৃ. ১০
৪. তদেব, পৃ. ১৩
৫. অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদনায়), 'রক্তকরবী', জে. এন. ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স, নূতন সংস্করণ- ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৭
৬. ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী'র তত্ত্ব ও তাৎপর্য, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, ১ম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৫৯, কলকাতা, পৃ. ১২
৭. তদেব, পৃ. ৯
৮. তদেব, পৃ. ১
৯. চৌধুরী, দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ. ৩৫৮
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪১৪
১১. তদেব, পৃ. ৪১৫
১২. তদেব, পৃ. ৪২৯
১৩. ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী': পরিক্রমা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ১ম প্রকাশ জন্মাষ্টমী, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ৪৪
১৪. সান্যাল, হিরণকুমার, সমালোচনা, পরিচয় ২৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬১, কলকাতা।
১৫. দত্ত, সুনীল, নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর (১৯৪২-১৯৮৬), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম প্রকাশ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, কলকাতা, পৃ. ৫৬
১৬. নতুন সাহিত্য, পঞ্চম বর্ষ, শ্রাবন ১৩৬১ (১৯৫৪), কলকাতা, পৃ. ৪৫
১৭. অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদনায়), 'রক্তকরবী', জে. এন. ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স, নূতন সংস্করণ- ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ২২
১৮. তদেব, পৃ. ৪
১৯. ঘোষ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ, 'রক্তকরবী'র তত্ত্ব ও তাৎপর্য, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, ১ম প্রকাশ জানুয়ারি, ১৯৫৯, কলকাতা, পৃ. ৫৪
২০. Hindustan Standard: July 23, 1954
২১. ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী': পরিক্রমা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ১ম প্রকাশ জন্মাষ্টমী, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ২৩
২২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪১৮
২৩. তদেব, পৃ. ৪১৯
২৪. ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী': পরিক্রমা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ১ম প্রকাশ জন্মাষ্টমী, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ৪৩

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 39
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 332 - 348
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাটক সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪২৪
২৬. তদেব, পৃ. ৪২৪
২৭. তদেব, পৃ. ৪২৫
২৮. তদেব, পৃ. ৪৩২
২৯. তদেব, পৃ. ৪২৬
৩০. তদেব, পৃ. ৪৩৭
৩১. তদেব, পৃ. ৪২২
৩২. তদেব, পৃ. ৪২১
৩৩. তদেব, পৃ. ৪২২
৩৪. তদেব, পৃ. ৪২১
৩৫. তদেব, পৃ. ৪১০
৩৬. অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদনায়), 'রক্তকরবী', জে. এন. ঘোষ অ্যাণ্ড সন্স, নূতন সংস্করণ- ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৫
৩৭. AT NEW EMPIRE The EXCELLENT RENDERING OF TAGORE PLAY, Statement, 13 July, 1954
৩৮. রবীন্দ্র নাটক সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, এস. বি. এস. পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃ. ৪১৩
৩৯. ঘোষ, অজিতকুমার (সম্পাদনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী': পরিক্রমা, প্রজ্ঞাবিকাশ, ১ম প্রকাশ জন্মাষ্টমী, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ২৯
৪০. তদেব, পৃ. ২৯-৩০
৪১. Statesman : July 13, 1954
৪২. দত্ত, সুনীল, নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর (১৯৪২-১৯৮৬), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম প্রকাশ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, কলকাতা, পৃ. ৫৬
৪৩. দেশ, ১লা শ্রাবণ, ১৩৬১